কন্যাশিশু আনবে আলো, বিশ্বটাকে রাখবে ভালো

আদরিয়া ইসলাম

আজ আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। কন্যা তুমি তুচ্ছ নও, নও তুমি ক্ষুদ্র যদি তুমি জেগে উঠো, তবে করবে বিশ্ব জয়। কবি নজরুলের ভাষায় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনে কন্যাশিশুর গুণগান গাইতে চাই আমরা সবাই। কন্যাশিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ ও তাদের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির বিষয়কে সামনে রেখে প্রতি বছর সারা বিশ্বে পালিত হয় আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস। কন্যাশিশুর প্রতি জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য রোধে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টিকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১১ সালের কন্যাশিশুদের শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি আইনি সহায়তা ও ন্যায্য অধিকার, চিকিৎসা, বৈষম্য থেকে সুরক্ষা, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে এ দিবসের সূচনা হয়। সারাবিশ্বে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর থেকে দিবসটি পালন করা হচ্ছে। কানাডায় প্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালনের প্রস্তাব করে। পরে ২০১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভায় এ প্রস্তাব গৃহীত। পরের বছর ২০১২ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে প্রথম আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- 'My Voice, Our Equal Future' যার ভাবার্থ করা হয়েছে, 'আমরা সবাই সোচ্চার বিশ্ব হবে সমতার' আমাদের দেশের জন্য প্রতিপাদ্যটি সময়োপযোগী হয়েছে।

কন্যাশিশু, চারদিকে তার বৈষম্যের প্রাচীর ঘেরা। কন্যাশিশুদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বয়োঃসন্ধিকাল, বিকাশ প্রক্রিয়া কর্মক্ষেত্র ও জীবনধারা মূল্যায়ন, সবই বাধাগ্রস্ত যুগে যুগে। কন্যাশিশুদের মেধা-মনন সীমাবদ্ধ গন্ডিতেই আবদ্ধ। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাহীন, সংকুচিত সমাজে তারা নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত। জন্মের পর থেকেই বৈষম্য ঘিরে ফেলে ওদের। খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার থেকে পর্যন্ত তারা বঞ্চিত। শিক্ষা বঞ্চিত এইসব কন্যাশিশুরাই এক সময় সমাজে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রগতির সাথে তালমিলিয়ে এগিয়ে চলা এ সমাজে ছেলে বা মেয়ে একই কথা হলেও প্রতি পদক্ষেপে কন্যাশিশুদের মোকাবিলা করতে হয় নানা বাধা বিপত্তি। নিরাপত্তাহীনতা তার জীবনকে ক্রমেই বিপদসংকুল করে তোলে। ছেলেকে যেমন মানুষ করার শিক্ষিত করার লক্ষ্য নিয়ে মা-বাবা বড়ো করে মেয়েকেও ঠিক একই চিন্তা ভাবনায় অর্থাৎ মানুষ করার চিন্তা ভাবনায় বড়ো করা উচিৎ। ছেলে বা মেয়ে নয় বরং সন্তান মানুষ করা, তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই বড়ো কথা। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসে ছেলে বড়ো হলে চাকরি করবে আর মেয়ে বড়ো হলে বিয়ে দিয়ে শশুড়বাড়ি পাঠাতে হবে– এই চিন্তা চেতনায় আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমাদের উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতে যদিও ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। তবে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক পরিবারই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়াই চূড়ান্ত পরিণতি মনে করে। যদিও এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু তা খুব ধীর গতিতে।

একসময় ছেলে আর মেয়েতে ছিল বিস্তর বিভেদ। অনেক পরিবারে কন্যাশিশু জন্ম হওয়াতে পরিবারের সবার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তো। মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল পদে পদে নিষেধাজ্ঞা। তাদেরকে নানাভাবে ছোটো করা হয়েছে, বানানো হয়েছে পুতুল। নিয়মের বেড়াজালে বন্দি ছিল মেয়েদের জীবন। একটা সময় মেয়েদের লেখাপড়া করার মতো সুযোগ ছিল না। সে অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে বেগম রোকেয়া সাখওয়াতের মতো মহিয়সী নারীরা এগিয়ে এসেছেন। তারা দেখিয়েছেন পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে ২০২১ সাল নাগাদ। মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য দরকার একটি সুস্থ সবল, শক্তিশালী, দক্ষ প্রশিক্ষিত এবং চৌকস কর্মশক্তির সমন্বিত প্রয়াস। যেখানে নারী পুরষ উভয়ের অংশগ্রহণ আবশ্যিক। আজ যোগ্যতার সাথে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা বিশ্ব রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে সমান ভূমিকা রেখে চলেছে। মেয়েরা এখন সর্বক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে। শুধু তাই নয় সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ বিমান নিয়ে শত্রুর দিকে উড়ে চলছে নারীরা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

প্রযুক্তির উৎকর্ষে পৃথিবী এগিয়েছে। সেই সাথে এগিয়েছে মানুষের ধ্যান-ধারণা চিন্তা চেতনা। চেতনার উৎকর্ষে আজ নারী পুরুষের বিভেদ, হিনমন্যতা সমাজ থেকে কমেছে ঠিকই কিন্তু সমাজ পুরোপুরি ছেলে মেয়েদের সমান অধিকার সমভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা কন্যাশিশুদের যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে হবে আমাদেরকেই।

বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ কন্যা শিশু। বাংলাদেশে কন্যা শিশু এক কোটি ৬০ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা দশ ভাগ। কিন্তু এই কন্যা শিশুরা নানাদিক দিয়ে অবহেলিত, নিরাপত্তাহীনতা আর অপুষ্টির শিকার ঘরে বাইরে সবখানে। সাধারণত দেশের বিভিন্ন জরিপ এবং গবেষণায় ১৫ থেকে ১৮-১৯ বছরের মেয়েরা গুরুত্ব পায়। কিন্তু ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সি কন্যা শিশুরা কী অবস্থায় আছে তার চিত্র পরিসংখ্যানে স্পষ্ট নয়। এই বয়সের কন্যাশিশুরা প্রধানত পরিবারে, রাস্তায় এবং স্কুলে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। তারা তা প্রকাশ করে না কিংবা ভয়ে প্রকাশ করতে পারে না। উচ্চবিত্ত পরিবারই হোক বা নিম্নবিত্ত কোথাও কন্যাশিশুরা নিরাপদ নয়, এমনকি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরাও এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি এসব বিষয়ে বাংলাদেশ উন্নতি করলেও শিশুর সুরক্ষা এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি। শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারেও নিরাপদ নয়। আমরা শিশুদের নিরাপদ পরিবেশ দিতে পারছি না। এর কারণ হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ একটি মেয়ে শিশুকে আমরা শিশু হিসেবে দেখছি না, দেখছি মেয়ে হিসেবে। পরিবারের আর্থিক সংকট গ্রামের মেয়েদের অবহেলা আর নির্যাতনের সূচনা হয়। অতি অল্প বয়সেই বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়ের কাঁধে চাপে পরিবারের সকল বোঝা ও দায়িত্ব। কম বয়সে বিয়ে, পর্দা প্রথা, সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় জন্য মেয়েদেরকে সবার আগে সুশিক্ষিত করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এসিড সারভাইভার ফাউন্ডেশন সূত্র মতে, শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ নারী ও কিশোরী এসিড সন্ত্রাসের শিকার। দারিদ্র্যতার কারণে বাসা বাড়িতে গৃহকর্তাদের হাতে শিশু-কিশোরীদের নির্যাতনের বিষয়টি সবারই জানা। শিশু মেয়েরা প্রতিনিয়ত ইভটিজিং, ধর্ষণ, খুন, অপহরণের শিকার হচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাল্য বিয়েতে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বাংলাদেশে ১৮ বছরের আগে বাল্যবিবাহের হার ৪৯ শতাংশ। শত প্রচার আর আইন করেও বাল্যবিয়ে বন্ধ করা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী শতকরা ৬৬ ভাগ কন্যা শিশুর ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। এর মধ্যে ৬৪ ভাগ কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ করে। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি। বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মেয়ের ১৫ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে হয়। ১৮ বছর বয়সের মধ্যে ৫২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়। সেভ দ্যা চিল্ড্রেন-এর তথ্য অনুসারে ১০ বছর বয়সি কন্যাশিশুদের অনেক বেশি বয়সি পুরুষের সাথে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। প্ল্যান বাংলাদেশ এর সমীক্ষা মতে পারিবারিক সহিংসতার কারণে ১৩ থেকে ১৮ বছরের গৃহবধূ ও মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি মারাত্মক শারীরিক আঘাতে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ ছাড়া এসিড, সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধমূরক ঘটনায় দেশের কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গ্রামের কন্যাশিশুদের শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে অভিভাবকদের অনাগ্রহ। গ্রামের বেশির ভাগ অভিভাবক তাদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতন। তাদের অভিমত, মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে ঘর, সুতরাং ঘরের কাজ শেখা ছাড়া তাদের আর শিক্ষার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও কন্যাশিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইউনিসেফের এক গবেষণা তথ্য মতে, শতকরা ৩৫ ভাগ কিশোরী অপুষ্টির শিকার। শূন্য থেকে ৪ বছর বয়সি কন্যাশিশু ছেলেদের চেয়ে ১৬ শতাংশ ক্যালরি ও ১২ শতাংশ প্রোটিন কম পায়। অপরদিকে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের এক জারিপে দেখা গেছে, দেশের শতকরা ৬০ ভাগ কিশোরী অপুষ্টি ও রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। যার মধ্যে ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সি ৪৩ ভাগ কিশোর-কিশোরীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১০ গ্রামের কম। দেশের কিশোর-কিশোরীর শতকরা ৪৩ জনের আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে এবং এর অভাবে স্নায়ুতন্ত্রের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। মেধা ও বুদ্ধিমত্তা কমে যায়।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণীত হয়েছে শিশু আইন ১৯৭৪। সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বির্নিমাণে সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় প্রণয়ন করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, জাতীয় শিশুশ্রম নীতিমালা ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং শিশু অধিকার আইন ২০১৩।

শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অর্জন ঈর্ষণীয়। বর্তমান সরকার দেশের সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যা শিশুদের জন্য বর্তমান সরকারের এক চমকপ্রদ উপহার। পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এতে ঝরে পড়ার হার অনেক কমে এসেছে। এছাড়াও ১৩ হাজার ৮৬১টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাতৃমৃত্যুর হার ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে কাজ করেছে সরকার।

সরকার বিগত বছরগুলোতে কন্যা শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য নানাবিধ নারীবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার ফলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলসমূহে ছাত্রী অনুপ্রবেশ এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি। শিক্ষা কন্যাশিশুর উন্নয়ন, বাল্যবিবাহরোধ এবং শিশুমৃত্যু হার কমানোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

পরিশেষে বলা যায়, কন্যাশিশুদের ছেলে সন্তান থেকে আলাদা নয়, বোঝা নয় বরং মানুষ করার, সুশিক্ষিত করার প্রত্যয় ধারণ করতে হবে। কন্যাশিশুর সমঅধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবার থেকেই নিশ্চিত করতে হবে। মা-বাবাকেই এই কাজটি প্রথমে করতে হবে। কন্যাশিশু ও নারীদের অধিকার অর্জিত হলে মানবসম্পদ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাবে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে নারীর উন্নয়ন আবশ্যক, কারণ আজকের কন্যাশিশু আগামী দিনের একজন প্রতিষ্ঠিত মহিয়সী নারী হবে- এমন স্বপ্ন এখন আর দুঃস্বপ্ন নয় কোনোভাবেই।

#

০৪.১০.২০২০ পিআইডি ফিচার